দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 29 AUG 1996 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে—

অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী

গত কিছুদিন যাবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সকল কিছুকে ছাপিয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করেছেন; পদত্যাগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও কয়েকটি হলের প্রভোস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য হয়েও আমি পদত্যাগী প্রভোস্টদের সংখ্যাটা নির্ণয় করতেই পারিনি। কোন কোন পত্রিকার ভাষ্যে প্রভোস্টের সংখ্যা হচ্ছে ৯ জন; একজন প্রভোস্টের নাম দু'হলে দেখান হয়েছে। অতি সম্প্রতি একজন প্রভোস্ট দু'হলের দায়িত্বে ছিলেন এমন ঘটনা ঘটেনি। তবে হানাদার পাকিস্তানী আমলে আলবদর উপাচার্য একই ব্যক্তিকে ফজলুল হক হল ও জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট নিয়োগ করেছিলেন। পত্রিকায় বর্ণিত যে ব্যক্তিকে দু'টো হলের প্রভোস্ট হিসাবে দেখান হয়েছে তিনি শহীদুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তাঁর মেয়াদ পূর্তির মাত্র ২ দিন আগে তিনি পদত্যাগ করেছেন, তাঁর উত্তরাধিকার নিয়োগও বহু পূর্বে হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে কোন সমস্যা ছিল না। তবে আরও পূর্বে পদত্যাগের বেশ ক'টি সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তাঁর হলে বহিরাগতদের আনাগোনা এবং শেষকালে একটি ছাত্র সংগঠনের নামে কতিপয় বহিরাগত, হলের কতিপয় ছাত্রের সহায়তায় হলটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। সহায়তাকারী ছাত্ররা যে কেবল সরকারী দলের ছিল তা নয়, বিরোধী দলেরও কেউ কেউ ছিল। ঐ সময়ে উপরোক্ত প্রশ্নে দু'একটি বক্তৃতা-বিবৃতি ছাড়া অন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা প্রশাসন গ্রহণ করেনি। সে সময় পার্শ্ববর্তী হলটি ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং প্রভোস্ট কট্টর বিএনপিপন্থী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের কালে তাঁর হলে তাঁরই হাউস টিউটরের ভাষায় সন্ত্রাসীরা গোলাগুলির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। সে ব্যাপারেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি বরং যে গতিতে সেদিন অকুস্থলে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা হাজির হয়েছিলেন, সে গতি বিশ্লেষণে মনে হয় যে বিষয়টি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। একই হলে আরও কতিপয় কর্মকাণ্ডের কথা শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অভিযোগ আকারে পেশ করতে গিয়ে প্রাক্তন উপাচার্যের কাছে অনেকটা নিগৃহীত হয়েছিলেন। সে হলের জনৈক হাউস টিউটর, সিন্ডিকেট সদস্য এবং সহযোগী অধ্যাপককে উপাচার্য 'বেয়াদব' বলতেও দ্বিধা করেননি। শহীদুল্লাহ হলে বলতে গেলে পালাক্রমে সন্ত্রাসী বা বহিরাগতরা অবস্থান করে আসছিল দীর্ঘদিন। সম্প্রতি ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনের অব্যবহিত পরেই বিক্ষুব্ধ অংশটি হলের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধির প্রত্যাশায় তারা ছাত্রলীগে যোগদানের ঘোষণা দেয়। এই হলের নিয়ন্ত্রণ পুনর্প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ছাত্রদল ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যে অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ প্রভোস্ট বিতর্কের সম্মুখীন হন; আয়নায় তাঁর অতীত কর্মের চেহারা দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই পদত্যাগ করেন বলে অনেকে আঁচ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হল জগন্নাথ হলেই ছাত্রলীগের কর্তৃত্ব ছিল এবং আছে। এখানে বহু সময়ে বহু ঘটনা ঘটেছে।

বহু ঘটনাই বহিরারোপিত, আমাদের স্মৃতিতে অতি সাম্প্রতিক ঘটনা হলো বুলবুল হত্যা ও জগন্নাথ হলে '৭১ সালের স্টাইলে নারকীয় আক্রমণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সেদিন বিএনপি'র সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সেদিনের নারকীয় ঘটনায় কোন কর্ণপাতই করেননি, যদিও সেদিন হলের প্রভোস্ট পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি জগন্নাথ হল পরিদর্শনেও যাননি; তাঁর বাসার সামনে প্রতিবাদী ছাত্রদের পুলিশ দিয়ে পেটানো হয়। কিছুদিন থেকেই সলিমুল্লাহ হলে ছাত্রলীগের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত হতে থাকে। এ হলের প্রভোস্ট বর্তমানে দেশের বাইরে। পত্রিকায় এসেছে তিনিও পদত্যাগ করেছেন। এ প্রভোস্টসহ উক্ত হলের একজন হাউস টিউটরও নীলদল বা আওয়ামী লীগের ভক্ত, অনুরক্ত ও সমর্থক নন। সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট তাঁর সকল হাউস টিউটর নিয়ে পদত্যাগ করলেও একই প্রবণতায় সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট বা একজন হাউস টিউটরও পদত্যাগ করেছেন বলে আমার জানা নেই। জহুরুল হক হল বহু আগে ছাত্রলীগের ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল। বিগত ৫ বছর তা ছাত্রলীগের দখলেই ছিল, তবে সেটা ছিল 'মন্টু গ্রুপ' ছাত্র লীগের হাতে; পত্র-পত্রিকায় অপর্যাপ্ত ব্যাখ্যার কারণে মনে হতে পারে যে, সে হলটা ছাত্রলীগের হাতে ছিল। মাত্র কিছুদিন আগেই ছাত্রলীগের ছেলেরা জহুরুল হক হলে উঠতে পেরেছে। সেটাও সম্ভব হয়েছে একটা মজার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেদিন হঠাৎ করে জহুরুল হক হল থেকে সব পুলিশ তুলে নেয়া হয়। আর এ ব্যাপারে প্রভোস্টকে কিছু জানানো হয়নি। তবে ধারণা করা হয়েছে যে, বিরোধী দল সমর্থক একটি ছাত্র সংগঠন যাতে রাস্তার অপর পারের হলটি থেকে এসে এই হলটি দখলে নিতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্ত পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করতে পারে তজ্জন্য পুলিশ তুলে নেয়া হয়েছিল, কিন্তু ঘটনা ঘটল ভিন্নতর। পুলিশের অনুপস্থিতিতে বিতাড়িত ছাত্ররা হলে ফিরে এলো এবং এ এফ রহমান হলের ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সহায়তায় এ এফ রহমান হলেও ছাত্রলীগ আসন গেড়ে বসল। এর ক'দিন আগে জিয়া হলে ছাত্রলীগের ১০/১২ জন ছাত্রকে নির্মমভাবে প্রহার করা হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া উত্তরাঞ্চলের হলগুলোতে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনে বাধাদান, মাইক ভাংচুর, মিলাদের তবারক লুণ্ঠন এবং হল প্রভোস্টদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে সাধারণ ছাত্রলীগ কর্মীরা এ এফ রহমান হল দখলের ব্যাপারটি অনেকটা ইতিবাচক বলেই মনে করেছে। এ হলের প্রভোস্ট যদিও এককালে গোলাপী সমর্থক ছিলেন, আজ তিনি পুরোপুরি সাদা দল সমর্থক। আগামী মাসে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ হলের প্রভোস্টের নামে উপাচার্যের অনুরূপ বাজেটের সীমা অতিক্রম করে হলের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ বা ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। হলের প্রভোস্টের বাড়ির সামনে হাউস টিউটর কোয়ার্টারগুলোকে বরং সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের মতো মনে হতো। এই হলের প্রভোস্ট নাকি ১৫ আগস্ট টিভি দেখা নিয়ে ভোটাভুটির আয়োজন করেছিলেন। যেহেতু হলটি ছিল ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে সেহেতু সঙ্গত কারণেই ভোটে তারাই জয়ী হলেছিল। এ ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরাঞ্চলের সব ক'টি আবাসিক হলেই ঘটতে পারত, কেননা সেগুলো 'চর' দখলের মতো বিশেষ ছাত্র সংগঠনের দখলে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো,

> *ভাবতে অবাক লাগে যে, 'যে উপাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির আলোচনায় কয়েক ঘণ্টার জন্য চেয়ার ছেড়ে দিতে বার বার অস্বীকৃতি জানিয়ে সিনেট ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করেছেন, তিনিই কিনা শুধুমাত্র কতিপয় ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে পদত্যাগ করলেন!"*

বিগত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ সব হলের আবাসিক ও সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিলেন। এ এফ রহমান হলের পর মুহসীন হলে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হলে মাত্র কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের কর্মীদের বেদম মারপিট করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের হলে ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অবশ্য বিগত ৫ বছর যাবত ছাত্রলীগের কোন ছেলে সাংগঠনিক পরিচয়ে ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে থাকতে পারেনি। এ বিষয়ে বহুবার উপাচার্য বা প্রশাসকদের কাছে দেন-দরবার করেও কোন ফলোদয় হয়নি। ছাত্রদল এ হলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পোড়ামাটি নীতির অংশ হিসাবে হল প্রভোস্টের অফিস পুড়িয়ে দিয়েছে। এ হলের প্রভোস্ট পদত্যাগ করেছেন। তা[illegible] কি কারণে পদত্যাগ করেছেন, তা বলেননি। প্রক্টরও নাকি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই পদত্যাগ করেছেন। অন্য হলগুলোর প্রভোস্টদের পদত্যাগের কারণটা একান্ত সহানুভূতিমূলক। সূর্যসেন হলের প্রভোস্ট মাত্র কয়েকমাস আগে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এখনও বোধহয় তাঁর বাড়িতে উঠতে পারেননি। অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এমন যে, তাঁর হলের নিয়ন্ত্রণ যে কোন মুহূর্তে ছাত্রলীগের হাতে চলে যেতে পারে। জামায়াত ও বিএনপি সমর্থক শিক্ষকবৃন্দ তাই অগ্রিম ব্যবস্থা রূপে প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে পদত্যাগের এ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করে। জিয়া হল থেকে ১৫ আগস্টের শোক মিছিলে হামলা হয়েছিল। এ হলের প্রভোস্ট ঐ ব্যাপারে কেন, আরও অনেক বিষয়ে আগেও কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তিনিসহ বঙ্গবন্ধু হল ও জসীমউদদীন হলের প্রভোস্ট পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ না করলেও তাঁদের মেয়াদ প্রায় ফুড়িয়ে যাচ্ছে। এঁরা যে পুনর্নিয়োগ পাবেন না তা প্রায় নিশ্চিত। অনেকে ধরে নিয়েছে আওয়ামী লীগের আয়ু মাত্র ৬ মাস, অতএব ভবিষ্যতের আশায় 'হিরো' হবার এই-ই সময়। তাঁরা যে কারণে পদত্যাগ করেছেন সে কারণে শহীদুল্লাহ, জহুরুল, জগন্নাথ, রোকেয়া, শামসুন্নাহার, কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্টরাও পদত্যাগ করতে পারতেন। কিন্তু একমাত্র রোকেয়া হলের প্রভোস্ট ছাড়া আর কেউ পদত্যাগ করেননি। শিক্ষক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সংস্থার প্রতিবাদের মুখে কট্টর বিএনপি সমর্থক এই প্রভোস্টের নিয়োগ মাত্র তিন দিন আগে উপাচার্য প্রদান করেছেন। তাঁর ব্যাপারে ছাত্রীদের কোন প্রতিক্রিয়া বা এ সব হলে শান্তি বিঘ্নিত না হলেও সহানুভূতিশীল পদত্যাগ এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

উপাচার্য এমাজউদ্দিনের পদত্যাগের আগেও অনেক সুযোগ ও লগ্ন এসেছে। জগন্নাথ হলের নারকীয় ঘটনা এবং বিভিন্ন সময় হাউস টিউটর প্রভোস্টদের বাসায় হামলার পরে তিনি পদত্যাগ করতে পারতেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে যখন ছাত্রদের প্রাণহানি হচ্ছিল তখন তিনি পদত্যাগ করতে পারতেন; যখন চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তীকে গুলিবিদ্ধ করল, ডঃ আরেফিন সিদ্দিকের বিভাগীয় প্রধানের অফিস তছনছ করল কিংবা যখন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীর বুকে সন্ত্রাসীরা অস্ত্র চেপে ধরেছিল। উপাচার্যের সামনেই মান্নান চৌধুরীর বুকে অস্ত্র চেপে ধরা হয়েছিল। ফিরিস্তি আরও বড় করা যায়— যার যে কোন একটির কারণে পদত্যাগ করে উপাচার্য 'হিরো' হয়ে যেতে পারতেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, 'যে উপাচার্য তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির আলোচনায় কয়েক ঘণ্টার জন্য চেয়ার ছেড়ে দিতে বার বার অস্বীকৃতি জানিয়ে সিনেট ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করেছেন, তিনিই কিনা শুধুমাত্র কতিপয় ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে পদত্যাগ করলেন। তা করলেন একান্ত ঢাকঢোল পিটিয়ে যা অগ্নিতে আরও ঘৃতাহুতি দিল। নিন্দুকরা বলছে, যে সব দুর্নীতিবাজের ভিড়ে মিশে গিয়ে নিজের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ঢাকতে বা আড়াল করতে উপাচার্য মহোদয় পদত্যাগ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেই দেখা যাবে কেঁচো খুঁড়তে কত সাপ বেরিয়ে আসছে।